এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

এপ্রিল ২০১৪

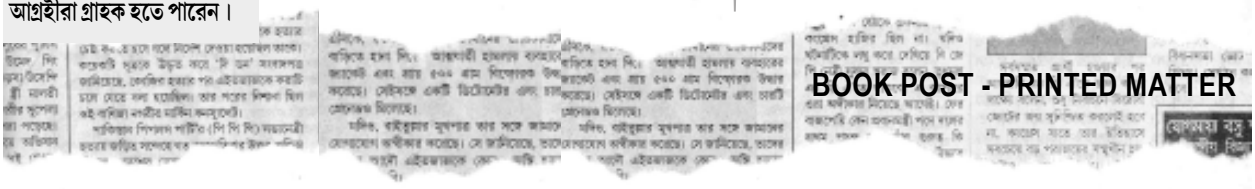

BOOK POST - PRINTED MATTER

আদর্শলিপি

১৯/১৪৬

ইসকুলে লম্বা ছুটি পড়ে গেলেই বা কী, সকাল হতেই কচিকাঁচাদের কলরবে মুখর দেনালাই আপার প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণ। ছেলেমেয়েরা এসেছে তাদের তৈরি সবজিবাগানের পরিচর্যা করতে। কারণ জৈব পদ্ধতিতে তৈরি এই বাগানের সবজিই তো তারা মিড-ডে-মিল-এর সাথে খায়। কিন্তু যত্ন না করলে তো বাগান নষ্ট হয়ে যাবে। কর্নাটকের বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামের পড়ুয়ারা এভাবেই হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও চাষের শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে পুষ্টিকর খাবারও পাচ্ছে নিয়মিত। এরাজ্যের আর্থ ট্রাস্ট নামের একটি সংস্থা স্কুলে জৈব সবজিবাগানের উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এমন কাজ চলছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং বাঁকুড়া জেলায়-ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের উদ্যোগে। সম্প্রতি মিড-ডে-মিল বিষয়ক কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিম-এ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি স্কুলে এই ধরনের বাগান তৈরির সুপারিশও করেছেন।

শকুন ?!

১৯/১৪৭

ফিরে আসছে বিভিন্ন জাতের শকুন। কেরলের ওয়েনাড ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংকচুয়ারিতে একটি সমীক্ষার পর পক্ষীবিদ সি শশীকুমার ও সি কে বিষ্ণুদাস একথা জানিয়েছেন। হোয়াইট ব্যাক্ড ভালচার, রেড হেডেড ভালচার এবং ইন্ডিয়ান ভালচার নামের তিন ধরনের শকুন এখানে দেখা গেছে প্রায় দুই দশক পর। সরকারি হিসেব অনুযায়ী এই তিন শকুনই এখন বিলুপ্তপ্রায়। বিলুপ্তপ্রায় গ্রে হেডেড ফিশ ঈগলও দেখা গেছে এখানে। সমীক্ষাটি করেছে কেরল সরকারের বন দফতর। সাহায্য করেছে ৫০ জন পক্ষীবিদ। কেরলে দেখা গেলে কী হবে, গোয়ায় এখন আর শকুন দেখা যাচ্ছে না। গোয়ায় ইন্ডিয়ান ভালচার ও হোয়াইট ব্যাক্ড ভালচার-এর দেখা মিলত এই কয়েক বছর আগেও। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার ২০১৩ সালে ১৫টি বিলুপ্তপ্রায় শকুনের এক তালিকা প্রকাশ করেছে। ইউনিয়ন বলছে,এই দুই শকুন গোয়ায় আর নেই।

অন্তপুর

১৯/১৪৮

সরকারি বিধিনিষেধ থাকলেও, গুজরাট লাগোয়া রাজস্থানের উদয়পুর জেলায় বিটি তুলো চাষ। এখানকার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক হারে এই তুলো চাষ হচ্ছে। বিটি তুলো হল একধরনের জিন পরিবর্তিত ফসল, যা নিজের শরীরেই বিষ তৈরি করে। এতে তুলোর ক্ষতিকারক পোকা বোল-ওয়ার্ম ফসল নষ্ট করতে পারে না। তবে সরকারের নিষেধাদেশ-এর কারণ, এর থেকে চাষিদের নানারকম চামড়ার রোগ, অ্যালার্জি দেখা দিচ্ছে। রাজস্থান সরকারের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এই খবর জানা গেছে।

গান্ধীনগর চলো...

১৯/১৪৯

গুজরাট বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড দেশীয় বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজ ব্যাঙ্ক তৈরি করছে। বোর্ডের সদস্য-সচিব এ পি সিং একথা জানিয়েছে। বোর্ড বলছে, গুজরাটে এখনো অনেক চাষি দেশী বীজে চাষ করেন, তবে সেই চাষ নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ। এই বীজ রাজ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে দিতে সংরক্ষণের এই উদ্যোগ। উল্লেখযোগ্য হল, দেশের বায়োডাইভার্সিটি আইন অনুযায়ী রাজ্যের জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ হল রাজ্য সরকারের অবশ্য কর্তব্য। বীজ যেহেতু এই বৈচিত্রের অন্যতম প্রধান অংশ, সেই কারণে গুজরাট সরকার একাজে উদ্যোগী হয়েছে এমন বলছেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু এর তোয়াক্কা করে না। ২০০২ সালে দেশে বায়োডাইভার্সিটি আইনটি পাশ হলেও এখনো অব্দি এরাজ্যে দেশীয় বীজের ব্যাঙ্ক তৈরির কোনো সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । অথচ ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এরাজ্যে বিভিন্ন ফসল, শাকসবজি, ফলফলাদির বৈচিত্র অনেক বেশি ।

কত উদ্যোগ ! !

১৯/১৫০

ভূমিক্ষয় ও জলাভাবে দেশ এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশের প্রায় ৫০ ভাগ জমি এখন ভূমিক্ষয় এবং জলাভাবে ভুগছে। এই সমস্যা বর্ষা-সিঞ্চিত এলাকায় আরো বেশি। কিন্তু জল ও জমি একসাথে মিলিয়ে যদি পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করা যায়, তবে এই অঞ্চলগুলিতে অনেক সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। আর তাই কেন্দ্রীয় সরকার সুসংহত জল-বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা (ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম বা আইডব্লুএমপি) নামে এক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, জমি ও জৈবিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূজলের বৃদ্ধি, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মিশ্র চাষ, কৃষি ভিত্তিক কাজের বৈচিত্র বৃদ্ধি করে সুস্থায়ী জীবন-জীবিকার মাধ্যমে পারিবারিক আয় বাড়ানোর কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব অনুযায়ী, গত নভেম্বর মাস অব্দি বিভিন্ন রাজ্যের জন্য আইডব্লুএমপি-র ৬৬২২টি প্রকল্পে ৩১৩ লক্ষ হেক্টর বর্ষা-সিঞ্চিত জমিতে কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এর জন্য খরচ হয়েছে ৮২৪০.৬১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ একাজ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নবম স্থানে রয়েছে। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে রাজ্যে ১.৮৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে একাজ করা হবে বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ৫০ ভাগ কাজও হয়নি ।

চিয়ার্স !

১৯/১৫১

ভারতে জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজ বাড়ছে । এজন্য সরকার নানারকম সহায়তাও করছে। ফলত ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে মোট ১৬০২৭৬.৯৫ মেট্রিক টন জৈব কৃষিজাত সামগ্রী রফতানি হয়েছে । এতে আয় হয়েছে ১১৫৫.৮১ কোটি টাকা । কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক সূত্রে এখবর পাওয়া গেছে ।

নাজে হাল

১৯/১৫২

দেশে কৃষি কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে । চাষি ও খেতমজুর মিলিয়ে এই সংখ্যা এখন ২৬ কোটি ৩০ লক্ষ । এর মধ্যে ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ চাষি, ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষ খেতমজুর । ২০০১ সালে জন-গণনায় এই সংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৪১লক্ষ । যার ভেতর ছিল ১২ কোটি ৭৩ লক্ষ চাষি এবং ১০ কোটি ৮৬ লক্ষ খেতমজুর। উল্লেখযোগ্য হল, কৃষি কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও মালিক চাষির সংখ্যা কমেছে এবং এই চাষিরাই খেতমজুরে পরিণত হয়েছে । ভারত বিশ্বব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপত্র মতো যে কৃষি-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাতে এ ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ এদের কৃষি-পরিকল্পনার মূলমন্ত্রই হল মালিক চাষি কমানো। অন্যদিকে যে 'কর্মহীন উন্নতি' ঘটে চলেছে তাতে চাষ ছেড়ে দেওয়া চাষি যুক্ত হতে পারছে না, ফলত তারাই খেতমজুর হচ্ছে। আবার খেতমজুর বাড়ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও।

তাই নাকি !

১৯/১৫৩

জৈব কৃষিকাজ বাড়াতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ (আইসিএআর) বিভিন্ন কৃষি-আবহাওয়া অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন ফসল ও তার চাষ পদ্ধতি (প্যাকেজ অফ প্র্যাক্টিস)-র উন্নতি ঘটিয়েছে । ইতিমধ্যে যে ১৪টি ফসলের জৈব উপায়ে চাষ পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছে সেগুলি হল, বাসমতী চাল,বৃষ্টি সিঞ্চিত এলাকার গম, ভুট্টা, অড়হর, মটর, সয়াবিন, টোম্যাটো,

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বাধাকপি, ফুলকপি,বাদাম,সরষে,ইসবগুল,গোলমরিচ ও আদা। আইসিএআর এইসব ফসলের জৈব চাষ পদ্ধতি নিয়ে প্রচারের কাজও করছে।

কী যে করি

১৯/১৫৪

জীবন চর্যা সংক্রান্ত রোগ এখন বাড়ছে। শারীরিক কসরতে অনাগ্রহ, মানসিক চাপ, অস্বাস্থ্যকর এবং জবরজং খাবার-এর কারণে অল্প বয়সেই এই ধরনের রোগ বাড়ছে। এছাড়া পড়াশোনার অত্যধিক প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। ফলে শিশু বয়সে প্রয়োজনীয় বিকাশের সুযোগ কমে যাচ্ছে। এইসব রোগের মধ্যে আছে, হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ, ক্যান্সার, শ্বাসযন্ত্রের গোলযোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। এসব খবর জানা গেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সূত্রে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই ধরনের রোগ কমানোর উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যার নাম লাইফস্টাইল ডিজিজ এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বা লিপ।

বাংলাদেশে বিটি বেগুনের চাষে ভারতের বিপদ

গত ৩০ অক্টোবর ২০১৩, বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানিয়েছে যে, ওদেশের ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (এনসিবি) পঞ্চম সভায় বিটি বেগুন-১,২,৩ও ৪ -এর (সীমিত মাঠ চাষের শর্তসাপেক্ষে) চাষের অনুমতি দিয়েছে। এর জন্য আবেদন করেছিল বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট (বারি)। ২০০৬ থেকে বারি ওদেশে ভারতীয় কোম্পানি মাহিকো-র সহযোগিতায় বিটি বেগুনের নিরীক্ষা চালিয়ে আসছে। মাহিকো মনসান্টো নিয়ন্ত্রিত একটি কোম্পানি। মনসান্টোর পেটেন্ট করা বিটি জিন (Cry1Ac) নিয়েই এইসব পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশে যে বিটি জিন (চিমেরিক টক্সিন সহ) ব্যবহার করা হয়েছে, ভারতে সে জিনকে প্রাথমিক অনুমোদনের আওতায় আনা হয়নি।

ভারত, বাংলাদেশ, ফিলিপিন্স এই তিন এশীয় দেশকে নিয়ে মনসান্টো-মাহিকোর বিটি বেগুন অভিযান। ভারত ও ফিলিপাইনস-এ এই অভিযান থমকে গেছে। ভারতে জিএমও তদারকি সংস্থা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রেজাল কমিটি (GEAC) বিটি বেগুনের পরীক্ষামূলক চাষের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও, সরকার ব্যাপক বিরোধিতার মুখে পড়ে। ফলে ২০০৯ সালে, ৮টি রাজ্যে গণ-আলোচনার পর তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ বিটি বেগুনের চাষে অনির্দিষ্টকালীন নিষেধাদেশ জারি করেন। এটা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

এরপর ফিলিপিন্সেও মাহিকো-মনসান্টো প্রতিরোধের মুখে পড়ে। সেখানে বিটি টালোং (বেগুন)-এর উপর নিষেধাদেশ জারি করে ফিলিপিন্স-এর কোর্ট অব অ্যাপিলস। আবেদনকারীর মধ্যে ছিল গ্রিনপিস, মাসিপাগ, কালিকাসান এবং ১৫ জন ব্যক্তি-আবেদনকারী। ২০১৩-র মে মাসে কোর্ট পূর্ণ আদেশ দেয়। শেষ আদেশ আসে সেপ্টেম্বর, ২০১৩-এ। ফলে মাহিকো-মনসান্টোর বিটি বেগুন অভিযান ব্যাপকভাবে ধাক্কা খায়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে তারা সফল হয় যা ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের মানুষের পক্ষে খুবই দু সংবাদ।

বাংলাদেশে এ নিয়ে প্রতিবাদ হয়। উবিনীগ সংস্থা এ নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন করে। তাদের প্রথম আবেদন খারিজ হয়ে গেলেও দ্বিতীয় আবেদনের নিরিখে হাইকোর্ট, বাংলাদেশ সরকারের কাছে জানতে চায় যে যথেষ্ট পর্যালোচনা না করেই সরকার কেন এই সিদ্ধান্ত নিল। এই রায় সরকারকে ৩ মাসের মধ্যে স্বাধীন গবেষণা চালিয়ে তার রিপোর্ট পেশ করতে বলে। কিন্তু বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত এই নিষেধাদেশ বাতিল করে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ সরকার জিন খাদ্যশস্য বিটি বেগুনের সীমিত চাষ শুরু করার শর্তসাপেক্ষ আদেশ জারি করে।

বিপদ আমাদের, বিপদ বাংলাদেশে

ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশীয় অঞ্চলটি বেগুনের উৎসভূমি। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে বেগুনের অনেক বৈচিত্র রয়েছে। কার্টাজেনা প্রোটোকল অনুযায়ী উৎসভূমিতে জিএমও-র বাণিজ্যিক চাষ কখনই স্বীকৃত নয়। কারণ অন্য জাতে জিএমও-র অংশবিশেষ ঢুকে পড়তে পারে। ফলে জীববৈচিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বিটি বেগুন নিষেধাদেশ এর ক্ষেত্রে যে দুটি বিষয় নিয়ে শ্রী জয়রাম রমেশ বলেছিলেন তার একটি হল, খাদ্য হিসেবে বিটি বেগুনের প্রভাব নিয়ে মানুষের ধারণা আর প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলির তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা উভয়ই অস্পষ্ট ।

বাংলাদেশ সরকার এবং এনসিবি যে দ্রুততার সাথে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে বহুজাতিক চাপ ছিল একথা খুব পরিষ্কার । চার ধরনের বিটি বেগুনের সীমিত চাষের কথা বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছে । এগুলি হল বিটি বেগুন-১ (উত্তরা), ২ (কাজলা), ৩ (নয়নতারা) এবং ৪ (ঈশ্বরদি লোকাল) । উত্তরা-র চাষ হবে রাজশাহীতে, কাজলা-র বরিশালে, নয়নতারা-র রংপুর ও ঢাকায় এবং ঈশ্বরদির চাষ হবে পাবনা ও চট্টগ্রামে ।

মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে একমাত্র বরিশাল একটু দূরত্বে হলেও বাকি সব জায়গাই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছে । বিটি বেগুনের আন্তর্দেশীয় চলাচল বাংলাদেশ সরকার কীভাবে বন্ধ করবে তা মোটেই পরিষ্কার নয় । একেই পরিবেশ সংক্রান্ত আইন খুব জোরদার নয়, তার উপর সীমান্তে চোরাচালান ব্যাপক। উদাহরণস্বরূপ, রানাঘাটের বাজারে গেলে আপনি বাংলাদেশি বেগুন চারা পাবেন। বাংলাদেশ থেকে অবৈধ উপায়ে পাওয়া বীজ ও ফল স্ট্রবেরি, আপেল কুল, ড্রাগনফ্রুট ইত্যাদির চাষ হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জেলায় । বিপদ এর থেকেই আঁচ করা যায় । কাঁটাতারের বেড়া এ ধরনের চলাচলে কোনদিনই বাধা দিতে পারে না । পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা - এই চারটি ভারতীয় রাজ্যকেই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যাতে উপরি-উক্ত ফলগুলোর মতোই বিটি বেগুন বা তার চারা যেন এদেশে ঢুকে পড়তে না পারে। বে-আইনি বিটি তুলোর চাষ যেমন এই শতাব্দীর গোড়ায় চালু হয়ে পরে তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাংলাদেশের বিটি বেগুন তেমনই সরকারের নিষেধাদেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভারতে পাড়ি দেবে। মনসান্টো-মাহিকো তাই চায়। তবে ভারত ও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সতর্ক থাকলে এই প্রয়াস বানচাল হবে।

ন তু ন | ব ই

খাওয়ার আইন । সবাই খাওয়ার আইন-খাদ্য সুরক্ষা আইন । তবে আইন করে সবাই খাবার পাবে কি পাবে না তা নিয়ে দোলাচল বার্তাজীবী -সমাজব্রতী -অর্থশাস্ত্রী সমাজে । এই বইতে এমনই যুক্তিবাণে ১০ চিন্তক ১০ নিবন্ধে, একেবারে জঁ দ্রেজ থেকে দেবিন্দর শর্মা ।
তৎসহ আইনের কথাসার ।

১/১৬ ডিমাই। হোয়াইটপ্রিন্ট। ৬৮ পাতা । ৫০

ডি আর সি এস সি
২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু